প্রতিসন্দর্ভের স্মৃতি

মলয় রায়চৌধুরী

মধ্যপ্রদেশ বাংলা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ কিছুকাল আগে অনুষ্ঠিত একটি সম্লেলনে বহির্বঙ্গ থেকে আসা সাহিত্যিকদের মাঝে হাংরি আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানতে পারেন যে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কেউই এই শিল্প - সাহিত্য আন্দোলনের নাম শোনেননি, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কাজ সম্পর্কে জ্ঞান তো দূরের কথা। দিল্লির দিগঙ্গন পত্রিকা যখন তাঁদের ১৪১১ উৎসব সংখ্যার জন্যে লেখা চাইলেন, আমার মনে হল দিল্লির লেখকরাও এই আন্দোলনের কথা শোনেননি, বা শুনে থাকলেও মিডিয়ার অপপ্রচারের দরুণ তাঁরা একটা ধোঁয়াটে ধারণা তৈরি করে ফেলেছেন হয়ত। আন্দোলনটা যেহেতু আমি আরম্ভ করেছিলুম, তাই অল্প পরিসরে ব্যাপারটা তুলে ধরা যেতে পারে

১৯৫৯-৬০ সালে আমি দুটি লেখা নিয়ে কাজ করছিলুম। একটি হল ইতিহাসের দর্শন যা পরে বিংশ শতাব্দী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যটি মার্কসবাদের উত্তরাধিকার যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটো লেখা নিয়ে কাজ করার সময়ে হাংরি আন্দোলনের প্রয়োজনটা আমার মাথায় আসে। হাংরি আন্দোলনের ‘হাংরি’ শব্দটি আমি পেয়েছিলুম ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসারের ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম বাক্যটি থেকে। ওই সময়ে, ১৯৬১ সালে, আমার মনে হয়েছিল যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদী নেতারা যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা টকে গিয়ে পচতে শুরু করেছে উত্তরঔপনিবেশিক কালখন্ডে।

উপরোক্ত রচনাদুটির খসড়া লেখার সময়ে আমার নজরে পড়েছিল ওসওয়াল্ড স্পেংলারের লেখা দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট বইটি, যার মূল বক্তব্য থেকে আমি গড়ে তুলেছিলুম আন্দোলনের দার্শনিক প্রেক্ষিত। ১৯৬০ সালে আমি একুশ বছরের ছিলুম। স্পেংলার বলেছিলেন যে কটি সংস্কৃতির ইতিহাস কেবল একটি সরলরেখা বরাবর যায় না, তা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়; তা হল জৈবপ্রক্রিয়া, এবং সেকারণে সমাজটির নানা অংশের কার কোন দিকে বাঁকবদল ঘটবে তা আগাম বলা যায় না। যখন কেবল নিজের সৃজনক্ষমতার ওপর নির্ভর করে তখন সংস্কৃতিটি নিজেকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে থাকে, তার নিত্যনতুন স্ফূরণ ও প্রসারণ ঘটতে থাকে। কিন্তু একটি সংস্কৃতির অবসান সেই সময়ে আরম্ভ হয় যখন তার নিজের সৃজনক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়ে তা বাইরে থেকে যা পায় তাই আত্মসাৎ করতে থাকে, খেতে থাকে, তার ক্ষুধা তৃপ্তিহীন। আমার মনে হয়েছিল দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এই ভয়ংকর অবসানের মুখে পড়েছে, এবং উনিশ শতকের মনীষীদের পর্যায়ের বাঙালির আবির্ভাব আর সম্ভব নয়। এখানে বলা ভালো যে আমি কলকাতার আদি নিবাসী পরিবার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশজ, এবং সেজন্য বহু ব্যাপার আমার নজরে যেভাবে খোলসা হয় তা অন্যান্য লেখকদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

ওই চিন্তা ভাবনার দরুণ আমার মনে হয়েছিল যে কিঞ্চিদধিক হলেও, এমনকি যদি ডিরোজিওর পর্যায়েও না হয়, তবু হস্তক্ষেপ দরকার, আওয়াজ তোলা দরকার, আন্দোলন প্রয়োজন। আমি আমার বন্ধু দেবী রায়কে, দাদা সমীর রায়চৌধুরীকে, দাদার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমার আইডিয়া ব্যাখ্যা করি, এবং প্রস্তাব দিই হাংরি নামে আমরা একটি আন্দোলন আরম্ভ করব। ১৯৫৯ থেকে টানা দুবছরের বেশি সে সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় দাদার চাইবাসার বাড়িতে থাকতেন। দাদার চাইবাসার বাড়ি, যা ছিল নিমডি নামে এক সাঁওতাল - হো অধ্যুষিত গ্রামের পাহাড় টিলার ওপর, সে-সময়ে হয়ে উঠেছিল তরুণ শিল্পী - সাহিত্যিকদের আড্ডা। ১৯৬১ সালে যখন হাংরি আন্দোলনের প্রথম বুলেটিন প্রকাশিত হয়, এবং ১৯৬২ সালে বেশ কয়েকমাস পর্যন্ত, আমরা এই চারজনই ছিলুম আন্দোলনের নিউক্লিয়াস।

ইউরোপের শিল্প - সাহিত্য আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছিল একরৈখিক ইতিহাসের বনেদের ওপর, অর্থাৎ আন্দোলনগুলো ছিল টাইম-স্পেসিফিক বা সময় কেন্দ্রিক। কল্লোল গোষ্ঠী এবং কৃত্তিবাস গোষ্ঠী তাঁদের ডিসকোর্সে যে নবায়ন এনেছিলেন সে কাজগুলোও ছিল কলোনিয়াল ইসথেটিক রিয়্যালটি বা ঔপনিবেশিক নন্দন - বাস্তবতার চৌহদ্দির মধ্যে, কেননা সেগুলো ছিল যুক্তিগ্রন্থনা নির্ভর এবং তাদের মনোবীজে অনুমতি ছিল যে ব্যক্তিপ্রতিস্বের চেতনা ব্যাপারটি একক, নিটোল ও সমন্বিত। সময়ানুক্রমী ভাবকল্পের প্রধান গলদ হল যে তার সন্দর্ভগুলো নিজেদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় উন্নত মনে করে, এবং স্থানিকতাকে ও অনুস্তরীয় আস্ফালনকে অবহেলা করে।

১৯৬১ সালের প্রথম বুলেটিন থেকেই হাংরির আন্দোলন চেষ্টা করল সময়তাড়িত চিন্তাতন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পরিসরলব্ধ চিন্তাতন্ত্র গড়ে তুলতে। সময়ানুক্রমী ভাবকল্প যে বীজ লুকিয়ে থাকে, তা যৌথতাকে বিপন্ন আর মিমূর্ত করার মাধ্যমে যে-মননসন্ত্রাস তৈরি করে, তার দরুণ প্রজ্ঞাকে যেহেতু কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তিলক্ষণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়, সমাজের সুফল আত্মসাৎ করার প্রবণতায় ব্যক্তিদের মাঝে ইতিহাসগত স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যক্তিক তত্ত্বসৌধ নির্মাণ। ঠিক এই জন্যেই, ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্য আন্দোলনগুলো খতিয়ে যাচাই করলে দেখা যাবে যে ব্যক্তিপ্রজ্ঞার আধিপত্যের দামামায় সমাজের কান ফেটে এমন রক্তাক্ত যে সমাজের পাত্তাই নেই কোন। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখব যে পুঁজিবলবান প্রতিষ্ঠানিকতার দাপটে এবং প্রতিযোগী ব্যক্তিবাদের লালনে সমসাময়িক শতভিষা গোষ্ঠী যে অস্তিত্বহীন। এমনকি কৃত্তিবাস গোষ্ঠীও সীমিত হয়ে গেছে দুতিনজন মেধাস্বত্বাধিকারীর নামে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি ঔপনিবেশিক নন্দনতন্ত্রের আগেকার প্রাকঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের কথা ভাবি, তাহলে দেখব যে পদাবলী সাহিত্য নামক স্পেস বা পরিসরে সংকুলান ঘটেছে বৈষ্ণব ও শাক্ত কাজ; মঙ্গলকাব্য নামক - ম্যাক্রো - পরিসরে পাবো মনসা বা চন্ডী বা শিব বা কালিকা বা শীতলা বা ধর্মঠাকুরের মাইক্রো-পরিসর। লক্ষণীয় যে প্রাকঔপনিবেশিক কালখন্ডে এই সমস্ত মাইক্রো - পরিসরগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তার রচয়িতারা নন। তার কারণ সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব ও বিকাশ ইউরোপীয় অধিবিদ্যাগত মননবিশ্বের ফসল। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিটি উপনিবেশে গিয়ে এই ফসলটির চাষ করেছে।

ইতিহাসের দর্শন নিয়ে কাজ করার সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে স্পেস বা স্থানিকতার অবদান হল পৃথিবী জুড়ে হাজার রকমের ভাষার মানুষ, হাজার রকমের উচ্চারণ ও বাকশৈলী, যখন কিনা ভাষা তৈরির ব্যাপারে মানুষ জৈবিকভাবে প্রোগ্রামড। একদিকে এই বিস্ময়কর হবুত্ব; অন্যদিকে সময়কে একটি মাত্র রেখা-বরাবর এগিয়ে যাবার ভাবকল্পনাটি, যিনি ভাবছেন সেই ব্যক্তির নির্বাচিত ইচ্ছানুযায়ী, বহু ঘটনাকে, যা অন্যত্র ঘটে গেছে বা ঘটছে, তাকে বেমালুম বাদ দেবার অনুমতি নকশা গড়ে ফ্যালে। বাদ দেবার এই ব্যাপারটা, আমি সেসময়ে যতটুকু বুঝেছিলুম, স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙালির ডিসকোসটি উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায়, যার ফলে নিম্নবর্গের যে প্রাকঔপনিবেশিক ডিসকোর্স বাঙালি সংস্কৃতিতে ছেয়ে ছিল, তা ঔপনিবেশিক আমলে লোপাট হয়ে যাওয়ায়। আমার মনে হয়েছিল যে ম্যাকলে সহেবের চাপানো শিক্ষাপদ্ধতির কারনে বাঙালির নিজস্ব স্পেস বা পরিসরকে অবজ্ঞা করে ওই সময়ের অধিকাংশ কবিলেখক মানসিকভাবে নিজেদের শামিল করে নিয়েছিলেন ইউরোপীয় সময়রেখাটিতে। একারণেই, তখনকার প্রাতিষ্ঠানিক সন্দর্ভের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের প্রতিসন্দর্ভের সংঘাত আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল প্রথম বুলেটিন থেকেই এবং তার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রতিটি বুলেটিন প্রকাশিত হবার সাথে-সাথে, যা আমি বহু পরে জানতে পারি, ‘কাউন্সিল ফর কালচারাল ফ্রিডাম’ -এর সচিব এ. বি. শাহ, ‘পি.ই.এন ইনডিয়ার অধ্যাক্ষ নিসিম এজেকিয়েল, এবং ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পুপুল জয়াকরের কাছ থেকে।

অমনধারা সংঘাত বঙ্গজীবনে ইতোপূর্বে ঘটেছিল। ইংরেজরা সমযকেন্দ্রিক মননবৃত্তি আনার পর প্রাগাধুনিক পরিসরমূলক বা স্থানিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাঙালি ভাবুকের জীবনে ও তার পাঠবস্তুতে প্রচন্ড ঝাঁকুনি আর ছটফটানি, রচনা আদল - আদরায় পরিবর্তনসহ, দেখা দিয়েছিল, যেমন ইয়ং বেঙ্গল সদস্যদের ক্ষেত্রে (হেনরি লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব ও আরও অনেকের ক্ষেত্রে। একইভাবে, হাংরি আন্দোলন যখন সময়কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক চিন্তাতন্ত্র থেকে ছিঁড়ে আলাদা হয়, উত্তরঔপনিবেশিক আমলে আবার স্থানিকতার চিন্তাতন্ত্রে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছিল, তখন আন্দোলনকারীদের জীবনে, কার্যকলাপে ও পাঠবস্তুর আদল-আদরায় অনুরূপ ঝাঁকুনি, ছটফটানি ও সমসাময়িক নন্দন কাঠামো থেকে নিষ্কৃতির প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। তা নাহলে আর হাংরি আন্দোলনকারীরা সাহিত্য ছাড়াও রাজনীতি, ধর্ম, উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা, দর্শনভাবনা, ছবি আঁকা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে ইস্তাহার প্রকাশ করবেন কেন।

হাংরি আন্দোলনের সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত, ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত। এই ছোট্ট সময়ে শতাধিক ছাপান আর সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছিল, অধিকাঅংশই হ্যান্ডবিলের মতন ফালিকাগজে, কয়েকটা দেয়াল - পোস্টারে তিনটি একফর্মা মাপে, এবং একটি (যাতে উৎপলকুমার বসুর ‘পোপের সমাধি’ শিরোনামের বিখ্যাত কবিতা ছিল) কুষ্ঠিঠিকুজির মতন দীর্ঘ কাগজে এই যে হ্যান্ডবিলের আকারে সাহিত্যকৃতি প্রকাশ, এরও পেছনে ছিল সময়কেন্দ্রিক ভাবধারাকে চ্যালেঞ্জের প্রকল্প। ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের পাঠবস্তুতে তো বটেই, মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র প্রজন্ম থেকে বাংলা সন্দর্ভে প্রবেশ করেছিল শিল্প-সাহিত্যের নশ্বরতা নিয়ে হাহাকার। পরে, কবিতা পত্রিকা সমগ্র, কৃত্তিবাস পত্রিকা সমগ্র, শতভিষা পত্রিকা সমগ্র ইত্যাদি দুই শক্ত মলাটে প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের এই নন্দনতাত্ত্বিক হাহাকারটিকে। পক্ষান্তরে, ফালিকাগজে প্রকাশিত রচনাগুলো দিলদরাজ বিলি করে দেয়া হতো, যে - প্রক্রিয়াটি হাংরি আন্দোলনকে দিয়েছিল প্রাকঔপনিবেশিক সনাতন ভারতীয় নশ্বরতাবোধের গর্ব। সেইসব ফালিকাগজ, যাঁরা আন্দোলনটি আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা কেউই সংরক্ষণ করার বোধ দ্বারা তাড়িত ছিলেন না, এবং কারোর কাছেই সবকটি পাওয়া যাবে না। ইউরোপীয় সাহিত্যে নশ্বরতাবোধের হাহাকারের কারণ হল ব্যক্তিমানুষের ট্র্যাজেডিকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রদান। যে ট্র্যাজেডি - ভাবনা গ্রেকো - রোমান ব্যক্তি এককের পতনযন্ত্রণাকে মহৎ করে তুলেছিল; পরবর্তীকালের ইউরোপে তা বাইবেলোক্ত প্রথম মানুষের ‘অরিজিনাল সিন’ তত্ত্বের আশ্রয়ে নশ্বরতাবোধ সম্পর্কিত হাহাকারকে এমন গুরুত্ব দিয়েছিল যে এলেজি এবং এপিটাফ লেখাটি সাহিত্যিক জীবনে যেন অত্যাবশ্যক ছিল।

আমরা পরিকল্পনা করেছিলুম যে সম্পাদনা ও বিতরণের কাজ দেবী রায় করবেন, নেতৃত্ব দেবেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সংগঠিত করার দিকটা দেখবেন দাদা সমীর রায়চৌধুরী, আর ছাপা এবং ছাপানোর খরচের ভার আমি নেব। প্রথমেই অসুবিধা দেখা দিল। পাটনায় বাংলা ছাপাবার প্রেস পাওয়া গেল না। ফলে ১৯৬১ সালের নভেম্বরে যে বুলেটিন প্রকাশিত হল, তা ইংরেজিতে। এই কবিতার ইশতাহারে আগের প্রজন্মের চারজন কবির নাম থাকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় ক্ষুন্ন হয়েছিলেন বলে ডিসেম্বরে শেষ প্যারা পরিবর্তন করে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অংশগ্রহণকারীদের নামসহ এই ইশতাহারটি আরেকবার বেরোয়। ১৯৬২ সালের শেশাশেষি সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। দাদার বন্ধু উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় যোগ দেন। আমার বন্ধু সুবিমল বসাক, অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় যোগ দেন, সুবিমল বসাকের বন্ধু ফাল্গুনী রায়, ত্রিদিব মিত্র, আলো মিত্র যোগ দেন। দেবী রায়ের বন্ধু প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, অরূপরতন বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সদীন্দ্র ভৌমিক, হরনাথ ঘোষ, নীহার গুহ, শৈলেশ্বর ঘোষ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমৃততনয় গুপ্ত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, শংকর সেন, যোগেশ পান্ডা, মনোহার দাশ যোগ দেন। তখনকার দিনে বামপন্থী ভাবধারার বুদ্ধিজীবীদের ওপর পুলিশ নজর রাখত। দেবী রায় লক্ষ্য করেন নি যে পুলিশের দুজন ইনফর্মার হাংরি আন্দোলনকারীদের যাবতীয় বইপত্র, বুলেটিন ইত্যাদি সংগ্রহ করে লালবাজারের প্রেস সেকশানে জমা দিচ্ছে এবং সেখানে ঢাউস সব ফাইল খুলে ফেলা হয়েছে।

এতজনের লেখালেখি থেকে সেই সময়কার প্রধান সাহিত্যিক সন্দর্ভের তুলনায় হাংরি আন্দোলন যে প্রতিসন্দর্ভ গড়ে তুলতে চাইছিল, সে রদবদল ছিল দার্শনিক এলাকার, বৈসাদৃশ্যটা ডিসকোর্সের, পালাবদলটা ডিসকার্সিভ প্র্যাকটিসের, বৈভিন্ন্যটা কথন-ভাঁড়ারের, প্রার্থক্যটা উপলব্ধির স্তরায়নের, তফাতটা প্রস্বরের, তারতম্যটা কৃতি-উৎসের। তখনকার প্রধান মার্কেট - ফ্রেন্ডলি ডিসকোর্সটি ব্যবহৃত হতো কবিলেখকের ব্যক্তিগত তহবিল সমৃদ্ধির উদ্দেশে। হাংরি আন্দোলনকারীরা সমৃদ্ধ করতে চাইলেন ভাষার তহবিল, বাচনের তহবিল, বাকবিকল্পের তহবিল, অন্ত্যজ শব্দের তহবিল, শব্দার্থের তহবিল, নিম্নবর্গীয় বুলির তহবিল, প্রভাষার তহবিল, ভাষিক ভারসাম্যহীনতার তহবিল, স্বরন্যাসের তহবিল, পংক্তির গতিচাঞ্চল্যের তহবিল, সন্নিধির তহবিল, পরোক্ষ উক্তির তহবিল, পাঠবস্তুর অন্তঃস্ফোটিক্রিয়ার তহবিল, তড়িত ব্যঞ্জনার তহবিল, বাক্যের অধোগঠনের তহবিল, খন্ডবাক্যের তহবিল, বাক্য-নোঙরের তহবিল, শীৎকৃত ধ্বনির তহবিল, সংহিতাবদলের তহবিল, যুক্তিছেদের তহবিল, আপতিক ছবির তহবিল, সামঞ্জস্যভঙ্গের তহবিল, কাইনেটিক রূপকল্পের তহবিল ইত্যাদি।

ইতোপূর্বে ইয়ংবেঙ্গলের সাংস্কৃতিক উথাল-পাথাল ঘটে থাকলেও, বাংলা শিল্প সাহিত্যে আগাম ঘোষণা করে, ইশতাহার প্রকাশ করে, কোন আন্দোলন হয়নি। সাহিত্য এবং ছবি আঁকাকে একই ভাবনা-ফ্রেমে আনার প্রয়াস, পারিবারিক স্তরে হয়ে থাকলেও, সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মাধ্যমে হয়নি। ফলত দর্পণ, জনতা, জলসা ইত্যাদি পত্রিকার আমাদের সম্পকে বানানো খবর পরিবেশিত হওয়া আরম্ভ হল। হাংরি আন্দোলনের রাজনৈতিক ইশতাহার নিয়ে প্রধান সম্পাদকীয় বেরোল যুগান্তর দৈনিকে। আমার আর দেবী রায়ের কার্টুন প্রকাশিত হল দি স্টেটসম্যান পত্রিকায়। হেডলাইন হল ব্লিৎস পত্রিকায়। সুবিমল বসাকের প্রভাবে হিন্দিভাষায় রাজকমল চৌধুরী আর নেপালী ভাষায় পারিজাত হাংরি আন্দোলনের প্রসার ঘটালেন। আসামে ছড়িয়ে পড়ল পাঁক ঘেটে পাতালে পত্রিকাগোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে। ছড়িয়ে পড়ল বগুড়ার বিপ্রতীক এবং ঢাকার স্বাক্ষর ও কণ্ঠস্বর পত্রিকাগুলোর সদস্যদের মাঝে, এবং মহারাষ্ট্রের আসো পত্রিকার সদস্যদের ভেতর। ঢাকার হাংরি আন্দোলনকারীরা (বুলবুল খান মাহবুব, অশোক সৈয়দ, আসাদ চৌধুরী, শহিদুর রহমান, প্রশান্ত ঘোষাল, মুস্তফা আনোয়ার প্রমুখ) জানতেন না যে আমি কেন প্রথম হাংরি বুলেটিনগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ করেছিলুম। ফলে তাঁরাও আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন ইংরেজিতে ইশতাহার প্রকাশের মাধ্যমে।

যার - যেমন - ইচ্ছে লেখালেখির স্বাধীনতার দরুন হাংরি আন্দোলনকারীদের পাঠবস্তুতে যে অবাধ ডিক্যাননাইজেশান, আঙ্গিকমুক্তি, যুক্তিভঙ্গ, ডিন্যারেটিভাইজেশান, অনির্নেয়তা, মুক্ত সমাপ্তি ইত্যাদির সূত্রপাত ঘটে, যে, সেগুলোর যাথার্থ্য, সার্থকতা ও প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকেন তখনকার বিদ্যায়তনিক আলোচকরা, যাঁরা বিবিধতাকে মনে করেছিলেন বিশৃঙ্খলা, সমরূপ হবার অস্বীকৃতিকে মনে করেছিলেন অন্তর্ঘাত, সন্দেহপ্রবণতাকে মনে করেছিলেন অসামাজিক, ক্ষমতাপ্রতাপের প্রতিরোধকে মনে করেছিলেন সত্যের খেলা। তাঁদের ভাবনায় মতবিরোধিতা মানে যেন অসত্য, প্রতিবাদের যন্ত্রানুষঙ্গ যেন সাহিত্যসম্পর্কহীন। মতবিরোধিতা যেহেতু ক্ষমতার বিরোধিতা, তাই তাঁরা তার যে কোন আদল ও আদরাকে হেয় বলে মনে করেছিলেন, কেননা প্রতিবিম্বিত ভাবকল্পে মতবিরোধিতা অনিশ্চয়তার প্রসার ঘটায়, বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত করে বলে অনুমান করে নেয়া হয়; তা যদি সাহিত্যকৃতি হয় তাহলে সাহিত্যিক মননবিশ্বে, যদি রাজনৈতিক কর্মকান্ড হয় তাহলে রাষ্ট্রের অবয়বে। এখানে বলা দরকার যে পশ্চিমবাংলায় তখনও রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেনি। তখনকার প্রতিবিম্বিত বিদ্যায়তনিক ভাবাদর্শে, অতএব, যারা মতবিরোধের দ্বারা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল, অর্থাৎ হাংরি আন্দোলনকারীরা, তারা অন্যরকম, তারা অপর, তারা প্রান্তিক, তারা অনৈতিক, তারা অজ্ঞান, তারা সত্যের অমনতর পার্থক্যহীন পরিসরে যাদের হাতে ক্ষমতা তাদের কব্জায় সত্যের প্রভূত্ব। অজ্ঞানের চিন্তাভাবনাকে মেরামত করার দায়, ওই তর্কে, সুতরাং, সত্য মালিকের।

প্রাগুক্ত মেরামতির কাজে নেমে বিদ্যায়তনিক আলোচকরা হাংরি আন্দোলনের তুলনা করতে চাইছেলেন পাঁচের দশকে ঘটে-যাওয়া দুটি পাশ্চাত্য আন্দোলনের সঙ্গে। ব্রিটেনের অ্যাংরি ইয়াং ম্যান ও আমেরিকা বিট জেনারেশনের সঙ্গে। তিনটি বিভিন্ন দেশের ঘটনাকে তাঁরা এমনভাবে উল্লেখ ও উপস্থাপনা করতেন, যেন এই তিনটি একই প্রকার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, এবং তিনটি দেশের আর্থ -রাজনৈতিক কাঠামো, কৌমসমাজের ক্ষমতা-নকশা, তথা ব্যক্তিপ্রতিস্ব নির্মিতির উপাদানগুলো অভিন্ন। আমার মনে হয় বিদ্যায়তনিক ভাবনার প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে সীমিত ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞতা; অর্থাৎ কেবলমাত্র বাংলা ভাষাসাহিত্য বিষয়ক পঠন-পাঠন। যার দরুণ সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের জীবনকে তাঁরা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন সাহিত্যের উপকরণ প্রয়োগ করে। যে-সমস্ত উপাদানের সাহায্যে কৌমসমাজটি তার ব্যক্তিক এককদের প্রতিস্ব নির্মাণ করে, সেগুলো ভেবে দেখার ও বিশ্লেষণের প্রয়াস তাঁরা করতেন না। প্রতিস্ব - বিশেষের পাঠবস্তু কেমন অমন চেহারায় গোচরে আসছে, টেক্সট - বিশেষের প্রদায়ক গুণনীয়ক কী-কী, পুঁজিপ্রতাপের কৌমকৃৎকৌশল যে প্রতিস্ব-পীড়ন ঘটাচ্ছে তার চাপে পাঠবস্তু - গঠনে মনস্তাত্ত্বিক ও ভাষানকশা কীভাবে ও কেন পাল্টাচ্ছে, আর তাদের আখ্যান ঝোঁকের ফলশ্রুতিই বা কেন অমনধারা, এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার বদলে, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত ভালোলাগা (ফিল গুড) নামক সাবজেকটিভ খপ্পরে পড়ে পাঠক - সাধারণকে সেই ফাঁদে টানতে চাইতেন। যে কোনও পাঠবস্তু একটি স্থানিক কৌমসমাজের নিজস্ব ফসল। কৌমনিরপেক্ষ পাঠবস্তু অসম্ভব।

কেবল উপরোক্ত দুটি পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ঘটনা নয়, ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যে যে আন্দোলনগুলো ঘটেছিল, যেমন নিমসাহিত্য, শ্রুতি, শাস্ত্রবিরোধী এবং ধ্বংসকালীন, তাদের সঙ্গেও হাংরি আন্দোলনের জ্ঞান-পরিমণ্ডল, দর্শন - পরিসর, প্রতিপ্রশ্ন-প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতা -বিন্যাস, চিন্তার - আকরণ, প্রতীতি, বিশ্লেষনী আকল্প, প্রতিবেদনের সীমান্ত, প্রকল্পনার মনোবীজ, বয়ন - পরাবয়ন, ভাষা-পরাভাষা, জগৎ-পরাজগৎ, বাচনিক নির্মিতি, সত্তাজিজ্ঞাসা, উপস্থাপনার ব্যঞ্জনা, অপরত্ববোধ, চিহ্নাদির অন্তর্বয়ন, মানবিক সম্পর্ক বিন্যাসের অনুষঙ্গ, অভিধাবলীর তাৎপর্য, উপলব্ধির উপকরণ, স্বভাবাতিযায়ীতা, প্রতিস্পর্ধা, কৌমসমাজের অর্গল, গোষ্ঠীক্রিয়ার অর্থবহতা, প্রতাপবিরোধী অবসত্রান্তের মাত্রা, প্রতিদিনের বাস্তব, প্রান্তিকায়নে স্বাতন্ত্র্য, বিকল্প অবলম্বন সন্ধান, চিহ্নায়নের অন্তর্ঘাত, লেখন-গ্রন্থনা, দেশজ অধিবাস্তব, অভিজ্ঞতার সুত্রায়ন - প্রকরণ, প্রেক্ষাবিন্দুর

সমন্বয়, সমষ্টি পীড়াপুঞ্জ, ইত্যাদি ব্যাপারে গভীর ও অসেতুসম্ভব পার্থক্য ছিল। ষাটের দশকের ওই চারটি আন্দোলনের সঙ্গে হাংরি প্রতিসন্দর্ভের যে-মিল ছিল তা এই যে পাঁচটি আন্দোলনই লেখকপ্রতিস্ব থেকে রোশনাইএক সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পাঠবস্তুর ওপর। অর্থাৎ লেখকের কেরামতি বিচার্য নয়; যা বিচার্য তা হল পাঠবস্তুর খুঁটিনাটি। লেখকের বদলে পাঠবস্তু যে গুরুত্বপূর্ণ, এই সনাতন ভারতীয়তা, মহাভারত ও রামায়ণ পাঠবস্তু দুটি দ্বারা প্রমাণিত।

অনুশাসন মুক্তির ফলে, লিটল ম্যাগাজিনের নামকরণের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল হাংরি আন্দোলন, যে তারপর থেকে পত্রিকার নাম রাখার ঐতিহ্য একাবারে বদলে গেল। কবিতা, ধ্রুপদী, কৃত্তিবাস, শতভিষা, উত্তরসূরী, অগ্রনী ইত্যাদি থেকে একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে হাংরি আন্দোলনকারীরা তাঁদের পত্রিকার নাম রাখলেন জেব্রা, উন্মার্গ, ওয়েস্টপেপার, ফুঃ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি। অবশ্য সাহিত্য - শিল্পকে উন্মার্গ আখ্যাটি জীবনানন্দ দাশ বহু পূর্বে দিয়ে গিয়েছিলেন, যদিও হাংরি আন্দোলনের সময় পর্যন্ত তিনি তেমন প্রতিষ্ঠা পান নি। জেব্রা নামকরণটি ছিল পাঠকের জন্যে নিশ্চিন্তে রাস্তা পার হয়ে হাংরি পাঠবস্তুর দিকে এগোবার ইশারা। হাংরি আন্দোলনের সময় পর্যন্ত তিনি তেমন প্রতিষ্ঠা পান নি। জেব্রা নামকরণটি ছিল পাঠকের জন্যে নিশ্চিন্তে রাস্তা পার হয়ে হাংরি পাঠবস্তুর দিকে এগোবার ইশারা। হাংরি আন্দোলন সংঘটিত হবার আগে ওই পত্রিকাগুলোর নামকরণেই কেবল এলিটিজম ছিল তা নয়, সেসব পত্রিকাগুলোর একটি সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। বুর্জোয়া মূল্যবোধ প্রয়োগ করে একে-তাকে বাদ দেয়া বা ছাঁচাই করা, যে কারণে নিম্নবর্ণের লেখকের পাঠবস্তু সেগুলোর পৃষ্ঠায় অনুপস্থিত, বিশেষকরে কবিতা। আসলে কোন - কোন রচনাকে ‘টাইমলেস’ বলা হবে যে জ্ঞানটুকু ওই মূল্যবোধের ধারক - বাহকরা মনে করতেন তাঁদের কুক্ষিগত, কেননা সময় তো তাঁদের চোখে একরৈখিক, যার একেবারে আগায় আছেন কেবল তাঁরা নিজে।

‘টাইমলেস’ কাগজে উদ্বেগ থেকে পয়দা হয়েছিল ‘আর্ট ফর আট সেক’ ভাবকল্পটি, যা উপনিবেশগুলোয় চারিয়ে নিয়ে মোক্ষম চাল দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ। এই ভাবকল্পটির দ্বারা কালো, বাদামি, সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ। এই ভাবকল্পটির দ্বারা কালো, বাদামি, হলদে চামড়ার মানুষদের বহুকাল পর্যন্ত এমন সম্মেহিত করে রেখেছিল সাম্রাজ্যবাদী নন্দনভাবনা যাদে সাহিত্য - শিল্প হয়ে যায় উদ্দেশ্যহীন ও সমাজমুক্ত, যাতে পাঠবস্তু হয়ে যায় বার্তাবর্জিত, যাতে সন্দর্ভের শাসক - বিরোধী অন্তর্ঘাতী ক্ষমতা লুপ্ত হয়, এবং তা হয়ে যায় জনসংযোগহীন। হাংরি বুলেটিন যেহেতু প্রকাশিত হতো হ্যান্ডবিলের মতন ফালিকাগজে, তা পরের দিনই সময় থেকে হারিয়ে যেত। নব্বইটির বেশি বুলেটিন চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির পক্ষেও ও বুলেটিনগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি।

যে কোন আন্দোলনের জন্ম হয় কোন না কোন আধিপত্য প্রণালীর বিরুদ্ধে। তা সে রাজনৈতিক আধিপত্য হোক বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৈতিক, নান্দনিক, ধার্মিক, সাহিত্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি আধিপত্য হোক না কেন। আন্দোলন - বিশেষের উদ্দেশ্য, অভিমুখ, উচ্চাকাঙ্খা, গন্তব্য হল সেই প্রণালীবদ্ধতাকে ভেঙে ফেলে পরিসরটিকে মুক্ত করা। হাংরি আন্দোলন কাউকে বাদ দেবার প্রকল্প ছিল না। যে কোন কবি বা লেখক, ওই আন্দোলনের সময়ে যিনি নিজেকে হাংরি আন্দোলনকারী মনে করেছেন, তাঁর খুল্লমখুল্লা স্বাধীনতা ছিল হাংরি বুলেটিন বের করার। বুলেটিনগুলোর প্রকাশকের নাম-ঠিকানা দেখলেই স্পষ্ট হবে (অন্তত যে-কটির খোঁজ মিলেছে তাদের ক্ষেত্রেও) যে, তার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্নজন কর্তৃক ১৯৬৩-র শেষ দিকে এবং ১৯৬৪-র প্রথমদিকে প্রকাশিত। ছাপার খরচ অবশ্য আমি বা দাদা যোগাতাম, কেননা, অধিকাংশ আন্দোলনকারীর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপল কুমার বসুও নিজের খরচে প্রকাশ করেছিলেন বুলেটিন। অর্থাৎ হাংরি বুলেটিন কারোর প্রাইভেট প্রপার্টি ছিল না। এই বোধের মধ্যে ছিল পূর্বতন সন্দর্ভগুলোর মনোবীজে লুকিয়ে থাকা সত্ত্বাধিকার বোধকে ভেঙে ফেলার প্রতর্ক যা সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয়রা এদেশে এনেছিল। ইউরোপীয়রা আসার আগে বঙ্গদেশে পার্সোনাল পজেশন ছিল, কিন্তু প্রায়ভেট প্রপার্টি ছিল না।

হাংরি আন্দোলনের কোন হেড কোয়ার্টার, হাইকমান্ড, গভর্নিং কাউনসিল বা সম্পাদকের দপ্তর ধরণের ক্ষমতাকেন্দ্র ছিল না, যেমন ছিল কবিতা, ধ্রুপদী, কৃত্তিবাষ ইত্যাদি পত্রিকার ক্ষেত্রে, যার সম্পাদক বাড়িবদল করলে পত্রিকা দপ্তরটি নতুন বাড়িতে উঠে যেত। হাংরি আন্দোলন কুক্ষিগত ক্ষমতাকেন্দ্রের ধারণাকে অতিক্রম করে প্রতিসন্দর্ভকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল প্রান্তবর্তী এলাকায়, যে কারণে কেবল বহির্বঙ্গের বাঙালি শিল্পী - সাহিত্যিক ছাড়াও তা হিন্দি, উর্দু, নেপালি, অসমীয়া, মারাঠি ইত্যাদি ভাষায় ছাপ ফেলতে পেরেছিল। এখনও মাঝে মাঝে মধ্যে কিশোর - তরুণরা এখান - সেখান থেকে নিজেদের হাংরি আন্দোলনকারী ঘোষণা করে গর্বিত হন, যখন কিনা আন্দোলনটি চল্লিশ বছর আগে, ১৯৬৫, সালে ফুরিয়ে গিয়েছে।

বিয়াল্লিশ বছর আগে সুবিমল বসাক, হিন্দি কবি রাজকমল চৌধুরীর সঙ্গে, একটি সাইক্লোস্টাইল করা ত্রিভাষিক (বাংলা - হিন্দি - ইংরেজি) হাংরি বুলেটিন প্রকাশ করেছিলেন, তদানীন্তন সাহিত্যিক সন্দর্ভের প্রেক্ষিতে হাংরি প্রতিসন্দর্ভ যে কাজ উপস্থাপন করতে চাইছে তা স্পষ্ট করার জন্যে। তাতে দেয়া তালিকাটি থেকে আন্দোলনের অভিমুখে কিছুটা হদিশ মিলবে ঃ

প্রথাগত সাহিত্য সন্দর্ভ	হাংরি প্রতিসন্দর্ভ
প্রাতিষ্ঠানিক	প্রতিষ্ঠানবিরোধী
শাসক সম্প্রদায় (টিরানি)	শাসকবিরোধী (প্রটেস্টার)
ভেতরের লোক (অন্দরুনি)	বহিরাগত (হামলাবোল)
এলিটের সংস্কৃতি (ঠাকোস্লা)	জনসংস্কৃতি
তৃপ্ত	অতৃপ্ত
আসঞ্জনশীল (কোহেসিভ)	খাপছাড়া (ব্রিটল)
লোকদেখানে (দিখাওয়া)	চামড়া ছাড়ানো (র বোন)
জ্ঞাত যৌনতা (পরিচিত)	অজ্ঞাত যৌনতা (অপরিচিত)
সোশিয়্যালাইট	সাশিয়েবল
প্রেমিক (দুলারা)	শোকরারী (মোর্নার)
একসট্যাসি	অ্যাগনি
নিশ্চল (আনমুভড)	তোলপাড় (টার্বুলেন্ট)
ঘৃণার ক্যামোফ্লাজ	ঘাঁটি ঘৃণা
আর্ট (ফিল্ম)	জনগণ (সিনেমা)
রবীন্দ্রসঙ্গীত (সুগম সঙ্গীত)	যে কোন গান
স্বপ্ন (ড্রিম)	দুঃস্বপ্ন (নাইট মেয়ার)
শিষ্ট ভাষা (টিউটর্ড)	গণভাষা (গাটি ল্যাংগুয়েজ)
রিডিমড (দায়মুক্ত)	আনরিডিমড (দায়বদ্ধ)
ফ্রেমের মধ্যে	ফ্রেমহীন (কনটেসটেটরি)
কনফরমিস্ট (অনুগত)	ডিসিডেন্ট (ভিন্নমতাবলম্বী)
উদাসীন (ইনডিফারেন্ট)	এথিকস - আক্রান্ত
মেইনস্টিম (মূলস্রোত)	ওয়াটারশেড (জলবিভাজিকা)
কৌতুহল	উদ্বেগ
আনন্দ (এন্ডোক্রিন)	উৎকণ্ঠা (আড্রোনালিন)

পরিণতি অবশ্যম্ভাবী	উন্মেষের শেষ নেই
সমাপ্তি প্রতিমা (অনুষ্ঠান)	সতত সৃজ্যমান (উৎসব)
ক্ষমতাকেন্দ্রিক (সিংহাসন)	ক্ষমতাবিরোধী (সিংহাসন ত্যাগী)
মনোহরণকারী (এন্টারটেইনার)	চিন্তাপ্রদানকারী (থটপ্রোভাকর)
আত্ম সমর্থন	আত্মআক্রমণ
আমি কেমন আছি (একপেশে)	সবাই কেমন আছে
প্রতিসম	অসম্বদ্ধ (ট্যাটার্ড)।
ছন্দের অ্যাকাউন্ট	বেহিসেবি ছন্দ খরচ
কবিতা নিখুঁত করতে কবিতা রিভাইজ	জীবনকে প্রতিনিয়ত রিভাইজ
কল্পনার খেলা	কল্পনার কাজ

১৯৬৩ সালের শেষ দিকে সুবিমল বসাকের আঁকা বেশ কিছু লাইন ড্রইং যেগুলো ঘন-ঘন হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত হচ্ছিল, তার দরুণ তাঁকে পরপর দুবার কফিহাউসের সামনে ঘিরে ধরলেন অগ্রজ বিদ্বজ্জন এবং প্রহারে উদ্যত হলেন, এই অজুহাতে যে সেগুলো অশ্লীল। একই অজুহাতে কফিহাউসের দেয়ালে সাঁটা অনিল করঞ্জাইয়ের আঁকা পোস্টার আমরা যতবার লাগালুম ততবার ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হল। বোঝা যাচ্ছিল যে কলোনিয়াল ইসথেটিক রেজিমের চাপ তখনও অপ্রতিরোধ্য। হাংরি আন্দোলনের ১৫ নম্বর বুলেটিন এবং ৬৫ নং বুলেটিন, যথাক্রমে রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্পর্কিত ইশতাহারের, যাকে বলে স্লো বলিং এফেক্ট, আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের এসট্যাবলিশমেন্টকে। আজকের ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে ইশতাহার দুদিকে অলমোস্ট প্রফেটিক বলা যায়। এরপর, যখন রাক্ষস জোকার মিকিমাউস জন্তুজানোয়ার ইত্যাদি কাগজে মুখোশে 'দয়া করে মুখোস খুলে ফেলুন' বার্তাটি ছাপিয়ে হাংরি আন্দোলনের পক্ষ থেকে মুখ্য ও অন্যান্য মন্ত্রীদের, মুখ্য ও অন্যান্য সচিবদের, জেলা শাসকদের, সংবাদপত্র মালিক ও সম্পাদকদের, বাণিজ্যিক লেখকদের পাঠান হল, তখন সমাজেরর এলিট অধিপতিরা আসরে নামলেন। এ ব্যাপারে কলকাঠি নাড়লেন একটি পত্রিকা গোষ্ঠীর মালিক, তাঁর বাংলা দৈনিকের বার্তা সম্পাদক এবং মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের খোরপোষে প্রতিপালিত একটি ইংরেজি ত্রৈমাসিকের কর্তাব্যক্তিরা।

১৯৬৪ এর সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলুম আমি, প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, দেবী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ এবং দাদা সমীর রায়চৌধুরী। এই অভিযোগে উৎপল কুমার বসু, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবো আচার্য এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইসু হয়ে থাকলেও, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। এরকম একটি অভিযোগ এই জন্যে চাপান হয়েছিল যাতে বাড়ি থেকে থানায় এবং থানা থেকে আদালতে হাতে হাতকড়া পরিয়ে আর কোমরে দড়ি বেঁধে চোরডাকাতদের সঙ্গে সবায়ের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। অন্তর্ঘাতের অভিযাগটি সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ থেকে মে ১৯৬৫ পর্যন্ত বজায় ছিল, এবং ওই নয় মাস যাবৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী তার বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনকারীরূপে চিহ্নিত প্রত্যেকের সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিল, এবং তাঁদের তখন পর্যন্ত যাবতীয় লেখালেখি সংগ্রহ করে ঢাউস-ঢাউস ফাইল তৈরি করেছিল, যেগুলো লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের কনফারেন্স রুমের টেবিলে দেখেছিলুম, যখন কলকাতা পুলিশ, স্বরাষ্ট দফতর, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ ও ভারতীয় সেনার উচ্চপদস্ত আধিকারিক এবং পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট জেনারালকে নিয়ে গঠিত একটি বোর্ড আমাকে আর দাদা সমীর রায়চৌধুরীকে কয়েক ঘন্টা জেরা করেছিল।

অভিযোগটি কোন সাংস্কৃতিক অধিপতির মস্তিস্কপ্রসূত ছিল জানি না। তবে অ্যাডভোকেট জেনারাল মতামত দিলেন যে এরকম আজেবাজে তথ্যের ওপর তৈরি এমন সিরিয়াস অভিযোগ দেখলে আদালত চটে যাবে। তখনকার দিনে টাডা-পোটা ধরণের আইন ছিল না। ফলত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে নিয়ে ১৯৬৫ সালের মে মাসে বাদবাকি সবাইকে ছেড়ে দিয়ে কেবল আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হল, এই অভিযোগে যে সাম্প্রতিকতম হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত আমার 'প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি অশ্লীল। আমার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা সম্ভব হল শৈলেশ্বর ঘোষ এবং সুভাষ ঘোষ আমার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়ে গেলেন বলে। অর্থাৎ হাংরি আন্দোলন ফুরিয়ে গেল। ওনারা দুজনে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুচলেকা দিলেন, যার প্রতিলিপি চার্জশিটের সঙ্গে আদালত আমায় দিল -

(১) আমার নাম শৈলেশ্বর ঘোষ। আমার জন্ম বগুড়ায় আর বড় হয়েছি বালুরঘাটে। আমি, ১৯৫৩ সনে বালুরঘাট হাই ইংলিশ স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি, ১৯৫৫ সনে বালুরঘাট কলেজ থেকে আই.এস.সি, ১৯৫৮ সনে বালুরঘাট কলেজ থেকে বি.এ., আর ১৯৬২ সনে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বাংলায় স্পেশাল অনার্স। ১৯৬৩ সনে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে একদিন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে দেবী রায় ওরফে হারাধন ধাড়া নামে একজন তাঁর হাংরি জেনারেশন ম্যাগাজিনের জন্য আমাকে লিখতে বলেন। তারপরেই আমি হাংরি আন্দোলনের লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হই। আমি ব্যক্তিগতভাবে খ্যাতিমান লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্র দত্ত, বাসুদেব দাশগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী এবং উৎপলকুমার বসুকে চিনি। গত এপ্রিল মাসে একদিন কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। এবং তিনি আমার কাছ থেকে কয়েকটা কবিতা চান। তাঁর কাছ থেকে আমি জানতে পারি যে, হাংরি বুলেটিনের একটা সংখ্যা খুব শীঘ্র প্রকাশিত হবে। মাসখানেক আগে আমি তাঁর কাছ থেকে একটা পার্সেল পেয়েছি। আমি মলয় রায়চৌধুরীকে চিনি। তিনি হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা। হাংরি জেনারেশন ম্যাগাজিনে আমি মোটে দুবার কবিতা লিখেছি। মলয় আমাকে কিছু লিফলেট আর দুতিনটি পত্রিকা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে কোন নির্দেশ তিনি আমাকে দেননি। সাধারণত এইসব কাগজপত্র আমার ঘরেই থাকত। এটুকু ছাড়া হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে আমি আর - কিছু জানি না। অশ্লীল ভাষায় লেখা আমার আদর্শ নয়। ১৯৬২ থেকে আমি হুগলি জেলার ভদ্রকালীতে ভূপেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ে স্কুল টিচার। মাইনে পাই দু'শ দশ টাকা। বর্তমান সংখ্যা হাংরি বুলেটিনের প্রকাশনার পর, যা কিনা আমার অজান্তে ও বিনা অনুমতিতে ছাপা হয়, আমি এই সংস্থার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না এবং হাংরি পত্রিকায় লিখব না। বর্তমান বুলেটিনটি ছাপিয়েছেন প্রদীপ চৌধুরী।

(২) আমার নাম সুভাষচন্দ্র ঘোষ। গত এক বৎসর যাবত আমি কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে যাতায়াত করছি/ সেখানে আমার সঙ্গে একদিন হাংরি আন্দোলনের উদ্ভাবক মলয় রায়চৌধুরীর পরিচয় হয়। সে আমার কাছ থেকে একটা লেখা চায় । হাংরি জেনারেশন বুলেটিনের খবর আমি জানি বটে কিন্তু হাংরি আন্দোলনের যে ঠিক কী উদ্দেশ্য তা আমি জানি না। আমি তাকে আমার একটা লেখা দিই যা দেবী রায় সম্পাদিত হাংরি জেনারেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি তা আমার রুমমেট শৈলেশ্বর ঘোষের কাছ থেকে পাই। সে হাংরি বুলেটিনের একটা প্যাকেট পেয়েছিল। আমি এই ধরণের আন্দোলনের সঙ্গে কখনও নিজেকে জড়াতে চাইনি, যা আমার মতে খারাপ। আমি ভাবতে পারি না যে এরকম একটা পত্রিকায় আমার আর্টিকেল 'হাঁসেদের প্রতি' প্রকাশিত হবে। আমি হাংরি আন্দোলনের আদর্শে বিশ্বাস করি না, আর এই লেখাটা প্রকাশ হবার পর আমি ওদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।

প্রসিকিউশনের পক্ষে এই দুজন রাজসাক্ষীকে তেমন নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি। তাই আমার বিরুদ্ধে সমীর বসু আর পবিত্র বল্লভ নামে দুজন ভুয়ো সাক্ষীকে উইটনেস বক্সে তোলা হয়, যাদের আমি কোন জন্মে দেখিনি, অথচ যারা এমনভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিল যেন আমার সঙ্গে কতই না আলাপ - পরিচয়। এই দুজন ভুয়ো সাক্ষীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা। আমার কৌসুলিদের জেরায় এরা দুজন ভুয়ো প্রমাণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রসিকিউশন আমার বিরুদ্ধে উইটনেস বক্সে তোলে, বলাবাহুল্য গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়ে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে। ফলে আমিও আমার পক্ষ থেকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাই জ্যোতির্ময় দত্ত, তরুণ সান্যাল আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। বহু সাহিত্যিককে অনুরোধ করেছিলুম, কিন্তু এনারা ছাড়া আর কেউ রাজি হননি। শক্তি এবং সুনীল, দুই বন্ধু, একটি মকদ্দমায় পরস্পরের বিরুদ্ধে, চল্লিশ বছর পর ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। সবায়ের সাক্ষ্য ছিল বেশ মজাদার, যাকে বলে কোর্টরুম - ড্রামা।

তেরটা আদালতঘরের মধ্যে আমার মকদমাটা ছিল নয় নম্বর এজলাসে। বিচারকের মাথায় ওপর হলদে টুনি বালবটা ছাড়া আলোর বালাই ছিল না জানালাহীন ঘরটায়।

অবিরাম ক্যাঁচোর - ক্যাচোর শব্দ অবসর নেবার অনুরোধ জানাতে দুই ব্লেডের বিশাল ছাদপাখা। পেশকার গাংগুলি বাবুর অ্যান্টিক টেবিলের লাগোয়া বিচারকের টানা টেবিল, বেশ উঁচু, ঘরের এক থেকে আরেক প্রাপ্ত, বিচারকের পেছনে দেয়ালে টাঙানো মহাত্মাগান্ধীর ফোকলা - হাসি রঙিন ছবি। ইংরেজরা যাবার পর চুনকাম হয়নি ঘরটা। হয়ত ঘরের ঝুলগুলোও তখনকার। বিচারকের টেবিলের বাইরে, ওনার ডান দিকে, দেয়াল ঘেঁষে, জাল - ঘেরা লোহার শিকের খাঁচা, জামিন - না- পাওয়া বিচারাধীনদের জন্যে, যারা ওই খাঁচার পেছনের দরোজা দিয়ে ঢুকত। খাঁচাটা অত্যন্ত নোংরা। আমি যেহেতু ছিলুম জামিনপ্রাপ্ত, দাঁড়াতুম খাঁচার বাইরে। ঠ্যাঙ ব্যথা করলে, খাঁচায় পিঠ ঠেকিয়ে।

পেশকার মশায়ের টেবিলের কাছাকাছি গোটাকতক আস্ত - হাতল আর ভাঙা - হাতল চেয়ার, কৌঁসুলিদের জন্যে। ঘরের বাকিটুকুতে ছিল নানা মাপের নড়বড় বেঞ্চ আর চেয়ার, পাবলিকের জন্য, ছারপোকা আর খুদে আরশোলায় গিজগিজে। টিপেমারা ছারপোকার রক্তে, পানের পিকে, ঘরের দেয়ালময় ক্যালিগ্রাফি। বসার জায়গা ফাঁকা থাকত না। কার মামলা কখন উঠবে ঠিক নেই। ওই সর্বভারতীয় ঘর্মাক্ত গ্যাঞ্জামে, ছারপোকার দৌরাত্ম্যে, বসে থাকতে পারতুম না বলে সারা বাড়ি এদিক - ওদিক ফ্যা - ফ্যা করতুম, এ-এজলাস চক্কর মারতুম, কৌতুহলোদ্দীপক সওয়াল-জবাব হলে দাঁড়িয়ে পড়তুম। আমার কেস ওঠার আগে সিনিয়ার উকিলের মুহুরিবাবু আমায় খুঁজে পেতে ডেকে নিয়ে যেতেন। মুহুরিবাবু মেদিনীপুরের লোক, পরতেন হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, ক্যাম্বিশের জুতো, ছাইরঙ শার্ট। সে শার্টের ঝুল পেছন দিকে হাঁটু পর্যন্ত আর সামনে দিকে কুঁচকি পর্যন্ত। হাতে লম্বালম্বি ভাঁজ করা ফিকে সবুজ রঙের দশ - বারটা ব্রিফ, যেগুলো নিয়ে একতলা থেকে তিনতলার ঘরে ঘরে - লাগাতার চরকি নাচন দিতেন।

আমার সিনিয়ার উকিল ছিলেন ক্রিমিনাল লইয়ার চন্ডীচরণ মৈত্র। সাহিত্য সম্পর্কে ওনার কোন রকম ধারণা ছিল না বলে লেবার কোর্টের উকিল সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও রাখতে হয়েছিল। চাকরি থেকে সাসপেন্ড ছিলুম কেস চলার সময়ে, তার ওপর কলকাতায় আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। খরচ সামলানো অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল।

আদালত চত্তরটা সবসময় ভিড়ে গিজগিজ করত। ফেকলু উকিলরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ''সাক্ষী চাই? এফিডেফিট হবে।'' বলে - বলে চেঁচাত মক্কেল যোগাড়ের ধান্দায়। সারা বাড়ি জুড়ে যেখানে - সেখানে টুলপেতে টাইপরাটারে ফটর ফটর ট্যারাবেঁকা টাইপ করায় সদাব্যস্ত টাইপিস্ট, পাশে চোপসানো - মুখ লিটিগ্যান্ট। একতলায় সর্বত্র কাগজ, তেলেভাজা, অমলেট, চা-জলখাবার, ভাতরুটির ঠেক। কোর্টপেপার কেনার দীর্ঘ কিউ। চাপরাসি - আরদালির কাজে যে সব বিহারিদের খোঁদলগুলো জবরদখল করে সংসার পেতে ফেলেচে। জেল থেকে খতরনাক আসামিরা পুলিশের বন্ধ গাড়িতে এলে, পানাপুকুরে ঢিল পড়ার মতন একটু সময়ের জন্যে সরে যেত ভিড়টা। তারপর যে কে সেই। সন্দর্ভ ও প্রতিসন্দর্ভের সামাজিক সংঘাতক্ষেত্র হিসেবে আদালতের মতন সংস্থা সম্ভবত আর নেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, যিনি ১৯৬৫ সালের চব্বিশে জুন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের সওয়াল - জবাবের সার্টিফায়েড কপিতে বিধৃত ইতিহাস দিয়ে আমার এই রচনার উপসংহার টানি।

১. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য -

পেশকার :	এই নিন, গীতার ওপর হাত রাখুন। বলুন, যা বলব ধর্মত সত্য বলব, সত্য বই মিথ্যা বলব না, কিছু গোপন করব না।
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	যা বলব ধর্মত সত্য বলব, সত্য বই মিথ্যা বলব না, কিছু গোপন করব না।
পেশকার :	নাম বলুন।
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	শক্তি চট্টোপাধ্যায়।
বিচারক অমল মিত্র :	কী কাজ করেন তাই বলুন। হোয়াট ইজ ইয়োর লাইভলিহুড?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	লেখালিখিই করি। এটাই জীবিকা।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি তো একজন বি. এ?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	হ্যাঁ, পরীক্ষা দিয়েছিলাম।
বিচারক অমল মিত্র :	আপনি বি. এ কিনা তাই বলুন। আপনি কি স্নাতক?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	আজ্ঞে না।
পাকলিক প্রসিকিউটর :	আপনি তো প্রথম থেকে হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই না?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	সমীরের ছোট ভাই মলয় ইংরেজি কবি চসার আর জার্মান ফিলোজফার অসওয়াল্ড স্পেংলারের আইডিয়া থেকে একটা নন্দনতত্ব দিয়েছিল। সেই আইডিয়া ফলো করে আমরা কয়েকজন মিলে আন্দোলনটা আরম্ভ করি।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	আসামি মলয় রায়চৌধুরীকে তাহলে চেনেন? কবে থেকে চেনেন?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	হ্যাঁ চিনি। অনেক কাল থেকে।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	কী ভাবে জানাশোনা হল?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	ওর বড় ভাই সমীর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সমীরের চাইবাসার বাড়িতে থাকার সময়ে আমি প্রচুর লিখতাম। সেই সুত্রে মলয়ের সঙ্গে ওদের পাটনার বাড়িতে পরিচয়।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	কারা - কারা এই হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আরম্ভ করেন?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	মলয় রায়চৌধুরী, ওর বড় ভাই সমীর রায়চৌধুরী, হারাধন ধাড়া (ওরফে দেবী রায়), উৎপল কুমার বসু আর আমি। ছাপাটাপার খরচ প্রথম থেকে ওরা দু ভাই-ই দিয়েছে। পরে আরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম বলব কি?
পাবলিক প্রসিকিউটর :	তা আপনি যখন পায়োনিয়ারদের একজন, তখন এই আন্দোলনের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখলেন না কেন?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	এমনিই। এখন আমার লেখার কাজ অনেক বেড়ে গেছে।
বিচারক অমল মিত্র :	ইউ মিন দেয়ার ওয়াজ এ ক্ল্যাশ অব ওপিনিয়ন? নট ক্ল্যাশ অব ইগো তাই সাপোজ?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	আজ্ঞে হ্যাঁ। তাছাড়া এখন আর সময় পাই না।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	কতদিন হল আপনি হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে যুক্ত নন?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	প্রায় দেড় বছর।
পাবলিক প্রসিকিউটর:	দেখুন তো, হাংরি জেনারেশনের এই সংখ্যাটি পড়েছেন কি না?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	পড়েছি। কবিতা পেলেই পড়ি।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার কবিতাটা পড়েছেন কি?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	হ্যাঁ, কবিতাটা আমি পড়েছি।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	ভালো লাগেনি।
পাবলিক প্রসিকিউটরর :	ভালো লাগেনি বলতে আপনি অবসিন...
ডিফেন্স কাউনসেল :	আই অবজেক্ট টু ইট ইয়োর অনার। হি কান্ট আস্ক লিভিং কোয়েশ্চেন ইন সাচ আ ওয়ে।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	ওয়েল, আই অ্যাম রিফ্রেজিং দি কোয়েশ্চেন। আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জী, ভালো লাগেনি বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	ভালো লাগেনি মানে ভালো লাগেনি।

	কোন কোন কবিতা পড়তে বালো লাগে, আবার কোনো কোনো কবিতা আমার ভালোলাগে না।
বিচারক অমল মিত্র :	সো দি ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন ওয়াজ বেসড অন লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস! হেয়ার ইউ মিন দি পোয়েম ডিডন্ট অ্যাপিল টু ইয়োর ইসথেটিক সেনসস?
শক্তি চট্টোপাধ্যায় :	ইয়েস স্যার।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	দ্যাটস অল।
ডিফেন্স কাউনসেল :	ক্রসিং হবে না।

২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য -

পেশকার :	এই বইটার ওপর হাত রাখুন এবং বলুন, যা বলব সত্য বলব, সত্য বই মিথ্যা বলব না।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	যা বলব সত্য বলব, সত্য বই মিথ্যা বলব না।
পেশকার :	আপনার নাম ?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
ডিফেন্স কাউনলেস :	আপনি কী করেন ?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় ফিচার লিখি।
ডিফেন্স কাউনসেল :	শিক্ষা?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষায় এম.এ।
ডিফেন্স কাউনসেল :	আপনার লেখা কোথায় প্রকাশিত হয়?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	আমি দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী, পূর্বাশা এবং আরও অনেক পত্রিকায় লিখি। পূর্বাশা আর প্রকাশিত হয় না। আমার অনেকগুলো বই আছে, আর তার মধ্যে একটার নাম 'বরণীয় মানুষের স্মরণীয় বিচার।' আমি অনেক কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস লিখেছি।
ডিফেন্স কাউনসেল :	আপনার শরীরে বা মনে খারাপ কিছু ঘটছে?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	না, তা কেন হবে? কবিতা পড়লে সেসব হয় না।
ডিফেন্স কাউনসেল :	দ্যাটস অল ইয়োর অনার।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	আপনি এই ম্যাগাজিনের বিষয়ে কবে থেকে জানেন?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	ওদের আন্দোলন সম্পর্কে আমি প্রথম থেকেই জানি।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	আপনি ওই জার্নালে লিখেছেন?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	না, লিখিনি কখনো।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	আপনি ও রকম কবিতা লেখেন?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	পৃথিবীর কোন দুজন কবি একই রকম লেখেন না, আর একইরকম ভাবেন না।
পাবলিক প্রসিকিউটর :	কবিতাটা কি অবসিন?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :	না। ইট কনটেইনস নো অবসিনিটি। ইট ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন অব অ্যান ইমপরট্যান্ট পোয়েট।

সাক্ষ্যাদি শেষ হবার পর দুপক্ষের দীর্ঘ বহস হল একদিন, প্রচুর তর্কাতর্কি হল। আমি খাঁচার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে। রায় দেবার দিন পড়ল ১৯৬৫ সালের আঠাশে ডিসেম্বর। ইতিমধ্যে আমেরিকার 'টাইম' ম্যাগাজিনে সংবাদ হয়ে গেছি। যুগান্তর দৈনিক 'আর মিছিলের শহর নয়' এবং 'যে ক্ষুধা জঠরের নয়' শিরোনামে প্রধান সম্পাদকীয় লিখলেন কৃষ্ণ ধর। যুগান্তর দৈনিকে সুফী এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় চন্ডী লাহিড়ী কার্টুন আঁকলেন আমায় নিয়ে। সমর সেন সম্পাদিত 'নাউ' পত্রিকায় পরপর দুবার লেখা হল আমার সমর্থনে। দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় হাংরি আন্দোলনের সমর্থনে সমাজ - বিশ্লেষণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। ধর্মযুগ, দিনমান, সন্মার্গ, সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান, জনসত্তা পত্রিকায় উপর্যুপরি ফোটো ইত্যাদিসহ লিখলেন ধর্মবীর ভারতী, এস. এইচ. বাৎসায়ন অজ্ঞেয়, ফনীশ্বর নাথ রেণু, কমলেশ্বর, শ্রীকান্ত ভর্মা, মুদ্রারাক্ষস, ধুমিল, রণেশ বকশি প্রমুখ। কালিকটের মালায়ালি পত্রিকা যুগপ্রভাত হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করল। বুয়েনস আয়ার্স-এর প্যানারোমা পত্রিকার সাংবাদিক আমার মকদ্দমা কভার করল। পাটনার দৈনিক দি সার্চলাইট প্রকাশ করল বিশেষ ক্রোড়পত্র। বিশেষ হাংরি আন্দোলন সংখ্যা প্রকাশ করল জার্মানির ক্ল্যাকেটোভিডসেডস্টিন পত্রিকা, এবং কুলচুর পত্রিকা ছাপালো সবকটি ইংরেজি ম্যানিফেস্টো। আমেরিকায় হাংরি আন্দোলনকারীদের ফোটো, ছবি - আঁকা রচনা অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করল সল্টেড ফেদার্স, ট্রেস, ইনট্রেপিড, সিটি লাইটস জার্নাল, সান ফ্রানসিসকো আর্থকোয়েক, র‍্যামপার্টস, ইমেজো হোয়্যার ইত্যাদি লিটল ম্যাগাজিন। সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল নিউ ইয়র্কের এভারগ্রিন রিভিউ, আর্জেনটিনার এল কর্নো এমপ্লমাদো এবং মেকসিকোর এল রেহিলেতে পত্রিকায়। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় টিটকিরি মারা ছাড়া আর কিছু করেন নি বাঙালি সাহিত্যিকরা।

ভুয়ো সাক্ষী, রাজ সাক্ষী আর সরকারি সাক্ষীদের বক্তব্যকে যথার্থ মনে করে আমার পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য নাকচ করেদিলেন ফৌজদারি আদালতের বিচারক। দুশো টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদান্ড ধার্য করলেন তিনি। আমি হাইকোর্টে রিভিশন পিটিশন করার জন্যে আইনজীবীর খোঁজে বেরিয়ে দেখলুম যে খ্যাতিমান কৌসুলিদের এক দিনের বহসের ফি প্রায় লক্ষ টাকা; অনেকে প্রতি ঘন্টা হিসেবে চার্য করেন; তাঁরা ডজনখানের সহায়ক উকিল দুপাশে দাঁড় করিয়ে বহস করেন। জ্যোতির্ময় দত্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন সদ্য লন্ডন - ফেরত ব্যারিস্টার করুণাশংকর রায়ের সঙ্গে। তাঁর সৌজন্যে আমি তখনকার বিখ্যাত আইনজীবী যুগেন সেনকে পেলুন। নিজের সহায়কদের নিয়ে তিনি কয়েক দিন বসে তর্কের স্ট্যাটেজি কষলেন। ১৯৬৭ সালের ছাব্বিশে জুলাই আমার রিভিশন পিটিশানের শুনানি হল। নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করে দিলেন বিচারক টি. পি. মুখার্জি।

হাংরি আন্দোলন চল্লিশ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে ব্যবসা। সমীর চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি (আমার দাদার নামের মিলটা কাজে লাগান হয়েছে) 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন' নামে একটা বই বের করেছেন। তাতে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ লেখককে আমি চিনি না। শক্তি, সন্দীপন, উৎপল, বিনয়, সমীর, দেবী, সুবিমল, এবং আমার রচনা তাতে নেই। অনিল, করুণা, সুবিমলের আঁকা ছবি নেই। একটিও ম্যানিফেস্টো নেই। বাজার নামক ব্যাপারটি একটি ভয়ংকর সাংস্কৃতিক সন্দর্ভ।